তৃতীয় অধ্যায়

লোকসংস্কৃতির উপাদান

লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের আলোচনার পূর্বে আমরা লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করে নেব। ইংরেজী 'Folklore' এর বাংলা প্রতিশব্দ রূপে 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটি এসেছে। তবে এই 'Folklore' এর বাংলা প্রতিশব্দ নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্যের শেষ নেই। বিভিন্ন গুণিজন 'Folklore' এর বাংলা প্রতিশব্দ ভিন্ন ভিন্ন চয়ন করেছেন। 'লোকযান' (ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়), 'লোকশ্রুতি' (ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য), 'লোককৃতি' (ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়) ইত্যাদি। তবে এই মত পার্থক্যের মধ্যে সকলেই একটি বিষয়ে একমত হয়েছেন, সেটি হল 'Folk' এর বাংলা প্রতিশব্দ 'লোক'। এই 'লোক' শব্দটির (Folk) সাধারণ অর্থ সাধারণ মানুষ বা জনগোষ্ঠী। আর 'Lore' শব্দটির মূল উৎস নিহিত আছে প্রাচীন টিউটনিক ভাষায়। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জ্ঞান বা জ্ঞান আহরণ করা। ডঃ মযহারুল ইসলাম এর অর্থ সম্পর্কে বলেছেন — 'যে শিক্ষা ঐতিহ্যগত, যে জ্ঞান ধর্মগত, যে ঐতিহ্যগত বিশ্বাস পশুপাখি, পরী, গাছ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। এক কথায় ঐতিহ্যগত জ্ঞান, শিক্ষা বা বিদ্যা, ইংরেজীতে বলা যায় — "Traditional Learning or Knowledge".[১] আধুনিক লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের আলোকে 'Folk' শব্দটি পেয়েছে বিশিষ্ট অর্থগত মাত্রা, যেখানে 'Folk' শব্দটি শুধুমাত্র প্রাচীন জনগোষ্ঠী বোঝাতে ব্যবহৃত হয় না। সমচেতনা ও জীবন-যাপন অন্বিত এবং সমঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ সংহত জনসমাজই লোক সমাজ এবং আধুনিক ধারনায় যে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া সংহত জনগোষ্ঠীই হল 'Falk' বা 'লোক'। তাই স্বল্পকথায় লোকসংস্কৃতির একটি কার্যকরী সংজ্ঞায় বলা যায় — জীবিকা, ধর্ম, আঞ্চলিকতা প্রভৃতি কোন বিশেষ স্বার্থে সংঘবদ্ধ একদল মানুষের সামগ্রিক জীবনচর্চার ও মানস চর্চার সংহত রূপ যা ঐতিহ্য রূপে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হয়, তাকে লোকসংস্কৃতি বলা চলে।

লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলিকে দুটি ভাগ করে নেওয়া যায়। প্রথমতঃ বস্তুধর্মী লোকসংস্কৃতি, দ্বিতীয়তঃ ভাবধর্মী লোকসংস্কৃতি। এই লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলিকে আলোচনার সুবিধার্থে নিম্নরূপ ভাবে সাজিয়ে নেবো।

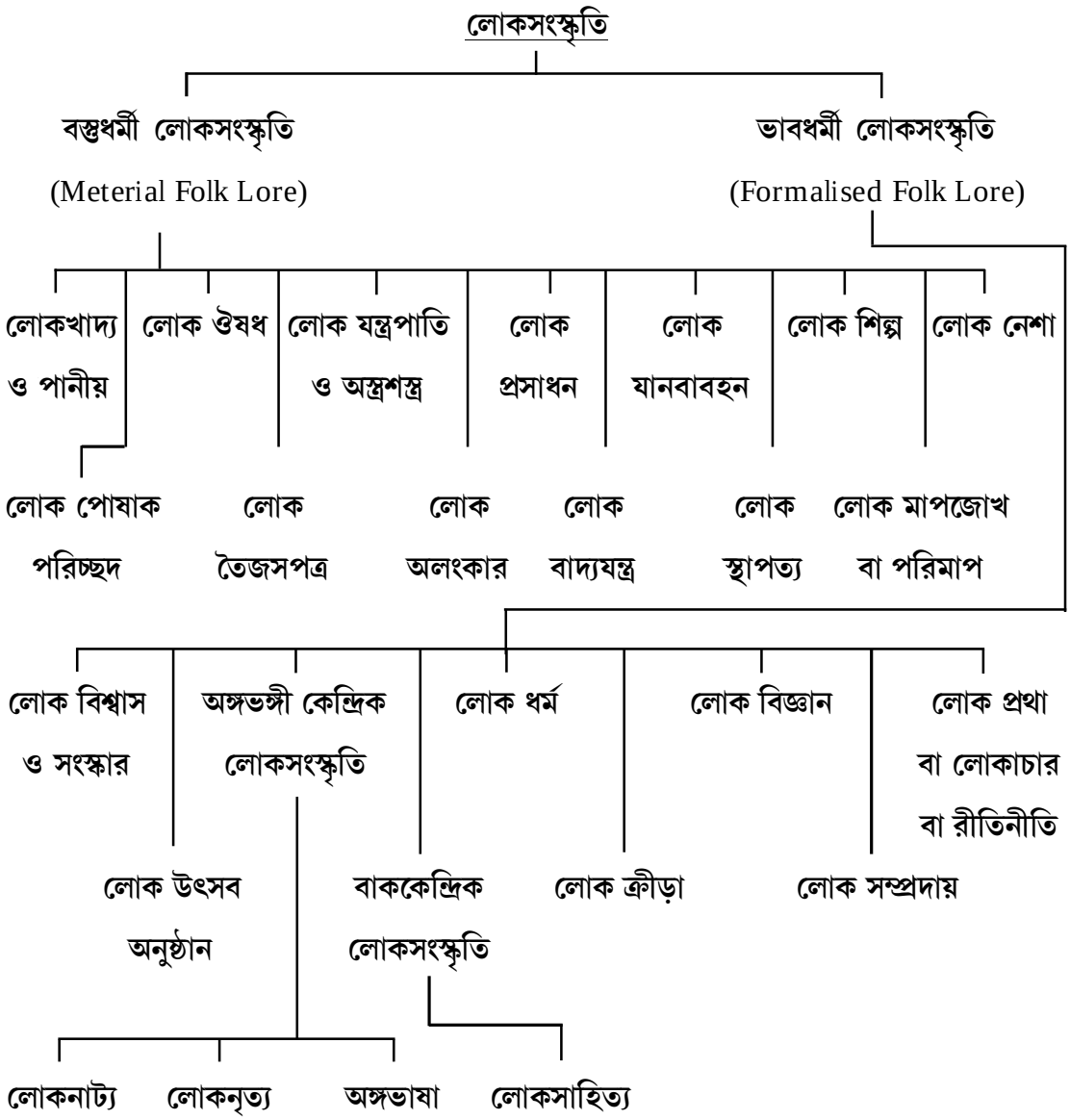

লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান এর মধ্যে প্রথমেই আমরা বস্তুধর্মী উপাদানগুলি নিয়ে আলোচনা করব। বস্তুধর্মী উপাদানের মধ্যে প্রথমেই যেটি আসে তা হল লোকখাদ্য ও পানীয়। লোক সমাজে বিভিন্ন ধরনের লোকখাদ্যের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন শস্য থেকে প্রস্তুত ভাত, মুড়ি, রুটি, পান্তা প্রভৃতি। এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খই, নাড়ু, চালভাজা, ছোলাভাজার প্রচলন দেখা যায়। এছাড়া পার্বণে গুড়পিঠা, বড়া, সরুপিঠা তৈরী হয়। আবার খেজুরের রস, তালের রস পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

একদিকে লজ্জা নিবারণ, অপর দিকে নান্দনিকতার প্রকাশ ঘটে পোশাক পরিচ্ছদ এর মাধ্যমে। লোক সমাজে বসবাসকারী নর-নারী তাদের জীবনযাত্রায় নানান ধরনের পোশাকের ব্যবহার করে। তবে তাদের পোশাকের মধ্যে তেমন চাকচিক্য বা আড়ম্বরতার ঝলক থাকে না। তা অত্যন্ত সাদামাঠা ধরনের। পুরুষেরা ধুতি, পাঞ্জাবী, পাগড়ি, গামছা, লুঙ্গি, চাদর ইত্যাদি ব্যবহার করে। মেয়েদের মধ্যে

বিভিন্ন ধরনের শাড়ির প্রচলন দেখা যায়। কেউ আবার ঘাঘরা, সেমিজ এসবও ব্যবহার করে।

আধুনিককালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি ঘটলেও কিছুদিন পূর্বেও গ্রামীন মানুষ তাদের রোগজ্বালা থেকে নিরাময়ের জন্য প্রকৃতির বিভিন্ন ভেষজ উপাদানের উপর নির্ভর করত। সর্দি-কাশির ক্ষেত্রে তুলসী পাতার রস, কৃমি নাশের জন্য কালমেঘ পাতা, আমাশয় নিরাময়ের জন্য থানকুনি পাতা প্রভৃতি লোক ঔষধকে কাজে লাগাত। আর এসমস্ত ভেষজ উপাদানের গুণাগুণ তারা তাদের দীর্ঘ দিনের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই উপলব্ধ করেছে।

লোকসমাজে লোকতৈজসপত্র হিসাবে বিভিন্ন দ্রব্যের ব্যবহার দেখা যায়। এসমস্ত দ্রব্য কখনো মাটি, পেতল, পাথর থেকে তৈরী হয়ে থাকে। আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে নানান মাটির দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। যথা — মিষ্টির ভাঁড়, গাছ লাগানোর টব, সরা, মালসা, মুড়ি ভাজার খোলা, জলের কলসী, গুড়ের হাঁড়ি প্রভৃতি। আবার পাথর থেকে তৈরি বাসন বিভিন্ন পূজাপাঠে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া রয়েছে নানান পেতল-কাঁসা থেকে তৈরী বাসনপত্র। থালা, বাটি, গ্লাস, পিলসুজ, ডাবু, হাতা, ছান্তা, পানের বাটা, পানের ডিবা, জাঁতি প্রভৃতি। আবার লোহা থেকে তৈরী কড়া, সাঁড়াশি, বঁটি, কুরনি, খুন্তি, হাতা ইত্যাদি লোকতৈজসপত্র লোক সমাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

জীবন জীবিকার প্রয়োজনে লোকসমাজ তার বিভিন্ন কাজকর্মে নানা যন্ত্রপাতির ব্যবহার করে থাকে। কৃষিকার্যের প্রয়োজনে লাঙল, কোদাল, কাস্তে, শাবল ব্যবহৃত হয়। আবার বঁটি, শীল-নড়া, জাঁতি, হামানদিস্তা গৃহস্থলীর নানা প্রয়োজন মেটায়। এছাড়াও কাঠের কাজে করাত, বাটালি, ছেনি, হাতুড়ি ব্যবহার করে। আবার প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ তাদের নানান প্রয়োজনে অস্ত্রের ব্যবহার করে এসেছে। প্রথম দিকে তার বিভিন্ন এবড়ো খেবড়ো পাথড়ের টুকরো, গাছের ডালকে তাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে আত্মরক্ষা ও পশু শিকার করেছে। পরবর্তী সময়ে লোকসমাজ তার প্রয়োজনে যে সমস্ত অস্ত্রের ব্যবহার করেছে সেগুলি হল তীর, ধনুক, তরবারি, বল্লম, বর্শা, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি।

মানুষ নিজেকে সুন্দর করে তোলার জন্য বিবিধ অলংকারে নিজেকে সাজিয়ে তোলে। লোক সমাজেও নানা লোক অলংকারের ব্যবহার প্রচলন ছিল। যার সাহায্যে মহিলারা নিজেদেরকে নব রূপে সাজিয়ে তুলতো। হাতের চুড়ি, বালা, পায়ের নূপুর, কানের বিভিন্ন ধরনের দুল, নাকে নথ, আঙুলের আংটি প্রভৃতি অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হত। আবার বিভিন্ন ধরনের ফুল, তার থেকে তৈরী মালা মানুষের অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লোক সমাজে এখনকার দিনের মতো অত্যাধুনিক এত লোক প্রসাধন এর প্রাচুর্য ছিল না।

তারা বিভিন্ন ভেষজ দ্রব্য দিয়েই তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা মেটাত। হলুদ লোক প্রসাধন হিসাবে নানা কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ত্বকের সুরক্ষা থেকে বিবাহের গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে এর ব্যবহার দেখা যায়। এছাড়া দুধের সর, কাজল, সিঁদুর লোক প্রসাধন হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

লোক সমাজে বিভিন্ন লোকবাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। এই বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি প্রাকৃতজ উপাদান দিয়ে তৈরী হয়। বাঁশি, একতারা, দোতারা, ঢাক, ঢোল, শাঁক প্রভৃতি। এছাড়া ঝাঁঝ, কাঁসর, ঘন্টা করতাল প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়।

লোক সমাজ তাদের নিজেদের প্রয়োজনে যে সকল যানবাহন ব্যবহার করত সেগুলিই লোকযানবাহন নামে পরিচিত। স্থলপথে যাতায়াতের ক্ষেত্রে তারা পালকি, গরুর গাড়ি, ঠেলা গাড়ি, ডুলি, চতুর্দোলা প্রভৃতির ব্যবহার করেছে। আর জলপথে যাতায়াতের ক্ষেত্রে তারা মূলত নির্ভর করেছে নৌকার উপর। এছাড়াও কলার মান্দাস, ডোঙ্গা, ডিঙ্গিকে কাজে লাগিয়েছে।

লোক সমাজে পাকাবাড়ির থেকে মাটি দিয়ে তৈরী বিভিন্ন প্রকার বাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিই লোকস্থাপত্য হিসাবে পরিচিত। যেহেতু মাটি, বাঁশ, খড় গ্রামীণ সমাজে সহজেই পাওয়া যায়, তাই এগুলি বেশি পরিমানে তারা ব্যবহার করেছে। বিভিন্ন আকারের গৃহ তারা নির্মাণ করে। যেমন চারচালা, ছ-চালা, আটচালা, বারোচালা প্রভৃতি। আবার ঘরের দেওয়ালে অনেক সময় বিভিন্ন লতা-পাতা, ফুলের নক্সাও আঁকা থাকে। গৃহের ছাউনিতে তারা খড়, শন, তালপাতার ব্যবহার করে থাকে।

লোক সমাজ তাদের নিজেদের প্রয়োজনে যে সকল শিল্প সামগ্রী তৈরি করে তাই লোক শিল্প হিসাবে পরিচিত। গ্রামীণ কারিগরদের দ্বারা তৈরি এই সকল দ্রব্য প্রয়োজনের তাগিদে তৈরী হলেও তাতে থাকে কারিগরের হাতের নান্দনিকতার স্পর্শ। বাঁশ থেকে তৈরী বিভিন্ন সরঞ্জাম — পোলা, খালুই, তালপাতা থেকে তৈরী বসার আসন, নারকেল গাছের পাতা থেকে প্রস্তুত ঝাঁটা, মহিলাদের দ্বারা নকশা করা বিভিন্ন ধরনের কাঁথা, টুপি, বেত থেকে তৈরী সরঞ্জাম, কাঠের বিভিন্ন আসবাবপত্র, উনুন, দোলনা, কুমোরের তৈরি মাটির নানা জিনিসপত্র প্রভৃতি লোক শিল্পের নমুনা। আবার 'ব্রত' অনুষ্ঠানে যে 'আলপনা' আঁকা হত তার শৈল্পিক রূপের দ্বারা সকলেই আকৃষ্ট হত।

লোক সমাজে বিভিন্ন প্রকার লোক নেশার দ্রব্য রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখ করা যায় তামাক, গাঁজা, ভাত পচিয়ে তৈরী করা হাঁড়িয়া, মহুয়ার ফল থেকে প্রস্তুত তরল পানীয় প্রভৃতি। আবার বিভিন্ন উৎসব ও ভাসানে সিদ্ধি নামে একপ্রকার নেশা দ্রব্য পান করা হয়। যা খুবই নেশা সৃষ্টি করে। এরই পাশাপাশি তাল গাছের রস থেকে তৈরি তাড়িও নেশা দ্রব্য হিসাবে লোক সমাজে ব্যবহৃত হয়।

এবার আমরা লোক সংস্কৃতির ভাবধর্মী উপাদানগুলি নিয়ে আলোচনা করব। এই ভাবধর্মী উপাদানের মধ্যো আসে লোকবিশ্বাস ও সংস্কাররের নাম। এই দুইয়েরই মূলে রয়েছে মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস। নানাবিধ অনিশ্চয়তা, মানসিক দুর্বলতা, ভাল-মন্দ ধারণা প্রভৃতির হাত ধরেই লোকবিশ্বাস সংস্কারের বিকাশ লাভ ঘটেছে। সমাজের গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের বংশ পরম্পরায় চলে আসা বিশ্বাসকে আমরা লোকবিশ্বাস বলতে পারি। তবে সমাজের শুধু নিরক্ষর মানুষের মনেই যে এই বিশ্বাস ঠাঁই পায় তা না, সাক্ষর মানুষেরাও একে বহন করে নিয়ে চলে। ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তীর ভাষায় — ''সংহত এক জনসমষ্টি যে বিশেষ বিশেষ আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াদিকে কর্তব্য অকর্তব্য বলে বিবেচনা করে, যেগুলির সঙ্গে শুভাশুভবোধ জড়িত, তাই হল লোকবিশ্বাস''।[২]

এগুলির সাথে ঐতিহ্যের যোগ খুব একটা থাকে না। লোকসমাজে নানান লোকবিশ্বাস ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন দুই জন মানুষ একসাথে জোড়া কথা বললে বাড়িতে চোর আসবে মনে করা হয়, শুক্রবারে নখ কাটা বারণ, মলমাসে বিবাহ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ, বাম হাত দিয়ে জলপান কার উচিত নয় প্রভৃতি। আর এই লোকবিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লোকসমাজের মানুষ যখন তাদের আচার-আচরণে একে প্রতিফলিত করে তখন তা লোকসংস্কারে পরিণত হয়। আসলে লোকবিশ্বাস একটা ধারণা, কিন্তু লোক সংস্কারের আচার-আচরণ প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত। লোকবিশ্বাস পালিত না হলেও কিছু এসে যায় না, কিন্তু লোক সংস্কার পালিত না হলে সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। যাত্রাকালে হাঁচি পড়লে অনেকে অশুভ বলে মনে করেন। এটি এক ধরনের লোকবিশ্বাস। কিন্তু এই হাঁচির জন্য যদি কেউ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গিয়ে আবার যাত্রা শুরু করে তখন তা শুধু বিশ্বাসে আটকে থাকে না, তা লোক সংস্কারে পরিণত হয়। সমাজে প্রচলিত অনেক সংস্কারের মূলে কোনো যৌক্তিক কারণ খুঁজে পাওয়া না গেলেও সমাজে প্রচলিত সকল বিশ্বাস-সস্কারই যে অমূলক এমন কথা বলা যায় না। তাই বিশ্লেষণ করে দেখলে তার নানা যৌক্তিক কারণ পাওয়া যায়। অনেক সময় বলা হয় বালিশে বসতে নেই, ফোঁড়া হয়। আসলে কারণ বালিশ ফেটে যাওয়া আটকাতেই ফোঁড়ার ভয় দেখানো হয়। তবে এই লোকবিশ্বাস ও লোক সংস্কার এর যে একটি অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও নৃতাত্ত্বিক মূল্য রয়েছে তা অনেকেই স্বীকার করেন।

বাঙালি সমাজে উৎসব এর শেষ নেই। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বন এই কথাটি তো প্রচলিতই আছে। দেখা যায় এই লোক উৎসবগুলি সু-প্রাচীন কাল থেকেই গ্রামীন সমাজে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে আসছে। আবার লোক সমাজে প্রচলিত এই উৎসব, মেলা-পার্বন সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করে। গবেষকের ভাষায় — ''উৎসবের উৎস, স্বরূপ ও বিকাশ আলোচনা করলে গ্রাম জীবনের মৌলিক ঐক্যের, সন্ধান পাওয়া যাবে। ভারতের

আত্মা রয়েছে গ্রামের উৎসবের মধ্যে। শুধু সমাজ, ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপাদান লুকিয়ে নেই, মানুষে মানুষে সম্পর্কের মহত্তম দিকগুলিও এতে নিহিত আছে। ... মানুষে মানুষে মিলনের এতবড় তীর্থ আর কিছুতেই নেই।''[৩]

আবার আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন — ''বাংলায় মেলা ও উৎসবের সংখ্যা অগণিত। তাদের দুটি প্রধান বিভাগ, প্রথমতঃ ধর্মীয়, দ্বিতীয়তঃ ধর্ম নিরপেক্ষ। ধর্মীয় মেলাগুলি ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত স্থানে উদ্ভব এবং বিকাশ লাভ করেছে। বছরের বিশেষ কোন কোন সময়ে ব্যবসা বাণিজ্যের গুরুত্বের উপর নির্ভর করে ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবে মেলার উদ্ভব ও বিকাশ হচ্ছে। যেমন সূর্য, পৃথিবী, নদ-নদী এইসব নৈসর্গিক বিষয়ে অলৌকিক আচারর আচরণের উপর ভিত্তি করে ধর্মীয় উৎসবগুলো গড়ে ওঠে, কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষ স্থানের মেলা ও উৎসবগুলো জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠে।''[৪]

লোক সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোক উৎসবগুলি হল — চড়ক-গাজন, ধর্ম ঠাকুরের উৎসব, ঝাঁপান, ভীম পূজা, করম প্রভৃতি।

এবার আমরা আসব অঙ্গভঙ্গী কেন্দ্রিক লোক সংস্কৃতির বিষয়ে। আদিম যুগের মানুষ যখন কথা বলতে শেখেনি তখন তারা তাদের অঙ্গ সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করত। তবে আবার এই অঙ্গ সঞ্চালনই কালে কালে বিকাশের মধ্য দিয়ে নৃত্যকলার জন্ম দেয়। এই অঙ্গভঙ্গী কেন্দ্রিক লোক সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে তিনটি বিষয়। যথা — লোকনাট্য, লোকনৃত্য ও অঙ্গভাষা।

প্রথমেই আমরা আসব লোকনাট্যের আলোচনায়। লোক সমাজে প্রাচীন কাল থেকেই লোকনাট্য এর প্রচলন রয়েছে। তবে গ্রামীন জীবনে নাট্যধর্মী যে কোন সৃষ্টিই লোকনাট্যের মর্যাদা পায় না। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকনাট্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন — ''লোকনাট্য লোক জীবনের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে মুখে মুখে রচিত এবং অভিনীত নাটক।''[৫]

আবার দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় এর কথায় — ''গ্রামীন সমাজে জনসাধারণের জীবনকে আশ্রয় করে মুখে মুখে রচিত রচনা যখন নাট্যলক্ষণাকান্ত হয়ে ওঠে, এবং যা আমাদের নৃত্য-গীতের মধ্য দিয়ে অভিনীত হয় — তাই লোকনাট্য।''[৬]

নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেছেন — ''কোনো লোকগোষ্ঠীর সংহতি জ্ঞাপক, Myth, Ritual জীবনচর্যার সকল দিক যখন তাদের অভিনয় ও সংলাপে প্রতিফলিত হয়, তখন তা লোকনাট্য হয়।''[৭]

এইসব মতামতের নিরিখে বলা যায় লোকনাট্য হল লোক সমাজের লোক সাধারণের দ্বারা মৌখিক ভাবে সৃষ্ট ও অভিনীত নাটক। তবে এর কাহিনীগুলি অনেক সময় বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত

হয়ে থাকে। এই লোকনাট্যের সুস্পষ্ট কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথমতঃ এটি একটি সরল শিল্প মাধ্যম। দ্বিতীয়তঃ এতে সঙ্গীত ও নৃত্যের বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয়তঃ এতে ঢাক, ঢোল প্রভৃতি লোকবাদ্য যন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। চতুর্থতঃ মঞ্চসজ্জা, আলোকসজ্জা অত্যন্ত সাদামাটা হয়। পঞ্চমতঃ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন লোকনাট্যের উদ্ভব ঘটে। যেমন — মুর্শিদাবাদে আলকাপ, মালদহে গম্ভীরা, উত্তরবঙ্গের পালাটিয়া প্রভৃতি। ষষ্ঠতঃ গ্রামের লোক সমাজই এই নাটকের রচয়িতা, অভিনেতা এবং দর্শক। সপ্তমতঃ লোকনাট্যে বাঁধা মঞ্চ থাকে না। তাই দর্শক এবং অভিনেতা কাছাকাছি আসার সুযোগ পায়। অষ্টমতঃ এই নাটকে বিবেক, জুড়ি, ভাঁড় প্রভৃতি চরিত্রের দেখা মেলে। নমবতঃ শুধুই মনোরঞ্জন নয়, এই নাটক লোক শিক্ষার কাজেও বড় ভূমিকা পালন করে। তাই দেখা যায় এর কাহিনীতে নানান সামাজিক সমস্যাও উঠে আসে। সাক্ষরতা প্রসার, পরিবার পরিকল্পনা, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি উঠে আসে এর কাহিনীতে। বাংলার প্রধান কয়েকটি লোকনাট্য হল — গম্ভীরা, আলকাপ, বোলান, ডোমনী, ষষ্ঠীমঙ্গল, কুশান, বিষহরা, লেটো, বনবিবি, ছৌ, মাজনি, যাত্রা, চোর-চুরনী প্রভৃতির নাম করা যায়। এই সমস্ত লোকনাট্যগুলি লোক মনোরঞ্জনের সাথে সাথে লোক জীবন ও লোক মননকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে।

আদিম অরণ্যচারী মানুষের যখন নির্দিষ্ট কোনো গৃহ ছিল না, তারা যাযাবরের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করত তখন তাদের মধ্যে ভাব থাকলেও ভাষা ছিল আজানা। তখন তারা নানা প্রকারের অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করত। এই অঙ্গভঙ্গীই পরবর্তী সময়ে নৃত্যের রূপ লাভ করেছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে। এই আদিম নৃত্যই পরবর্তী সময়ে লোকনৃতকে প্রভাবিত করেছে। তবে আদিম নৃত্যের মধ্যে যে উদ্দামতার প্রকাশ ঘটে তা লোকনৃত্যে অনেকটা পরিশীলিত হয়ে প্রকাশ লাভ করে। লোকনৃত্যের একটি সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে — "Folk dance is communal reaction in movement patterns to life's crucial cycles. Its true magicoreligious function concerns prescrvtion of the individual and the race. Natural cultures dance from the cradle to the grave, mechanized society, for sociability and diversion.[৮]

আসলে লোকনৃত্য হল সংহত সমাজের সমষ্টিগত মানুষের নৃত্যানুষ্ঠান। লোকনৃত্য যেমন আদিম নৃত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, ঠিক একই ভাবে পরবর্তীকলে সৃষ্ট শাস্ত্রীয় নৃত্যও লোকনৃত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। লোকনৃত্য সাধারণত সহজ সরল ও স্বতস্ফূর্ত হয়। এতে নির্দিষ্ট কোনো বাঁধা ধরা নিয়ম থাকে না বলে লোকনৃত্য জটিলতার হাত থেকে মুক্ত। এই নৃত্যে গ্রামের নারী পুরুষ সকলেই অংশ গ্রহণ করে। এই নাচের মধ্য দিয়ে তারা তাদের আনন্দও প্রকাশ করে আবার কখনো তাদের কামনারও বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আবার এই লোকনৃত্যে লোক সঙ্গীতের ব্যবহার প্রায়শই চোখে

পড়ে। বাংলায় প্রচলিত ও জনপ্রিয় লোকনৃত্যগুলি হল — ছৌ, পাইক, ঢালী, নাটুয়া, জারি, নাচনি, ঢাকি, পাতা, পুতুল, মেছোনি, রাবনকাটা, টুসু, ভাদু, ধামাইল, ঘাটু, ধামালি, ভাঁজো, ঝুমুর, মুখামেল, রায়বেঁশে প্রভৃতি।

লোকসংস্কৃতির ভাবধর্মী উপাদানের মধ্যে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি লোকসংস্কৃতির একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। এই বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির একটা ভাগ লোকসাহিত্য। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে — ''লোকসাহিত্য সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি।''[৯]

আবার মযহারুল ইসলাম লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন — ''যে সাহিত্য সুপ্রাচীনকাল থেকে মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে এসেছে, এখনো প্রচলিত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, সেগুলোই লোকসাহিত্য''।[১০]

লোকসাহিত্য লোক সমাজের পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে। এটি ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা সৃষ্টি হলেও যখন তা সমষ্টির সৃষ্টি হয়ে ওঠে, তখনই তা লোকসাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে। এই লোকসাহিত্যের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। প্রথমতঃ লোকসাহিত্য প্রধানত মুখে মুখে রচিত হয়ে প্রচার লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ লোকসাহিত্যের ভাষায় জটিলতার স্পর্শ থাকে না। তা অত্যন্ত সহজ সরল। তৃতীয়তঃ এটি ব্যক্তির রচনা হয়েও সমষ্টির সৃষ্টি রূপে মান্যতা পায়। চতুর্থতঃ লোকসাহিত্যে কৃত্রিমতার স্থান থাকে না। লোকসাহিত্যের বিষয় সমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা — ১) লোককথা ঃ রূপকথা, ব্রতকথা, পশুকথা, পরীকথা, নীতিকথা, রসকথা, কিংবদন্তী, লোকপুরাণ ইত্যাদি। ২) লোকসঙ্গীত ঃ বাউল, ঝুমুর, টুসু, পটুয়া, গাজন, জারি, সারি, চটকা, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি প্রভৃতি। ৩) প্রবাদ-প্রবচন, ৪) ছড়া, ৫) ধাঁধা প্রভৃতি।

লোকসাহিত্যের একটি বিষয় লোককথা। ইংরাজী 'Folktale' এর বাংলা পরিভাষা হিসাবে 'লোককথা' শব্দটি এসেছে। মানুষের গল্প বলার ও গল্প শোনার ঝোঁক সেই প্রাচীনকাল থেকেই। যখন গুহাবাসী মানুষেরা শিকার থেকে ফিরে এসে তাদের নানান অভিজ্ঞতার কথা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিত। সেই থেকে গল্পের যাত্রা শুরু। লোকসমাজে মৌখিক মাধ্যমে চলে আসা এই সকল গল্পকথাকেই লোককথা (Folkate) বলে।

অনিমেষ কান্তি পাল এর মতে — ''গল্পকেই সাধারণ ভাবে বলা হয় কথা। যেসব গল্প মৌখিক এবং যেগুলির প্রচলন নিরক্ষর কিংবা স্বল্প শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেগুলিকেই লোককথা বলে চিহ্নিত করা হয়।''[১১]

লোককথার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ — প্রথমতঃ লোককথার মাধ্যমে মানুষের অবসর বিনোদন যেমন হয়, তেমনি এগুলির মাধ্যমে মানুষ আবার নীতিশিক্ষার জ্ঞানও লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ এতে মূল কাহিনীর পাশাপাশি শাখা বা উপকাহিনীর কোন হদিস মেলে না। তৃতীয়তঃ এসকল গল্পে যে সকল চরিত্রের ভিড় দেখা যায় তারা অধিকাংশই Typc বা প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র। চতুর্থতঃ শুধু মানুষ নয়, অনেক লোককথায় পশুর খোঁজ মেলে। তাদের মুখে বসানো হয় মানুষের ভাষা। পঞ্চমতঃ এসমস্ত গল্পগুলি নিছক গল্পমাত্র নয়। এর মধ্য দিয়ে সমাজের মানুষজন তাদের না পাওয়া ইচ্ছেগুলোর পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটায়। লোককথার বিষয়গুলি হল —

ক) রূপকথা ঃ লোকসাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখা রূপকথা। এখানে মানুষ তার সকল ইচ্ছার চরিতার্থতা ঘটায়। এখানে দেখানো হয় শুভ শক্তি ও অশুভ শক্তির বিরোধ। গল্পের শেষে শুভ শক্তির জয় দেখা যায়। রূপকথায় যে জগৎ এর কথা বলা হয় তা কোন নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমানার মধ্যে আটকে থাকে না, তাই এখানে অবস্থানকারী চরিত্রগুলি শুধু ভারতের মধ্যে না থেকে সমগ্র বিশ্বের হয়ে পড়ে। আসলে রূপকথার মধ্য দিয়ে মানুষের মনের গোপন ইচ্ছা পূর্ণতা পায়। জীবন সংগ্রামে হেরে যাওয়া, কিছুই না পাওয়া মানুষগুলো এখানে একটা কল্প জগৎ তৈরী করে নিয়ে নিজেদের দুঃখ, যন্ত্রণাকে ভুলতে চায়। তাই দেখা যায় নায়ক চরিত্র প্রথমে অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখিন হলেও গল্পের শেষে তার জীবনে আসে আশার আলো। তবে এখানে অদৃষ্ট বা নিয়তি বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। নায়ক চরিত্রের পাশাপাশি মন্ত্রী পুত্র বা কোটাল পুত্রের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। আবার রাক্ষস খল চরিত্র রূপে থাকে। রূপকথায় অলৌকিকতার বাহুল্য থাকলেও আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন — ''বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রেমের পরই রূপকথায় ভাগ্যের স্থান। গ্রাম্য মানুষ স্বভাবতই তাদের জীবনের স্বার্থকতা এবং ব্যর্থতার জন্য ভাগ্যকে দায়ী করে থাকে। তাদের এই মনোভাবই এই সকল গল্পের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। এই সকল কাহিনীতে ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয়, ন্যায়ের বিচার এবং উদ্যোগী কর্মীর জীবনে সাফল্য চিত্রিত হয়ে থাকে। এই আশাবাদী সুর টুকুই রূপকথাগুলোকে অলৌকিকত্বের মোহজাল ছিন্ন করে মানব জীবনের কাছাকাছি নিয়ে আসে।''[১২]

খ) ব্রতকথা ঃ ব্রতকথা গ্রাম্য মেয়েদের একান্ত নিজস্ব সম্পদ। এর মধ্য দিয়েই তারা নিজেদের মনোভাব সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করে থাকে। ব্রতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন — ''কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বলি ব্রত।''[১৩]

আবার এই ব্রতকথাগুলির উৎপত্তির কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন — ''ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশা বিপর্যয় ঘটত সেগুলিকে প্রতিহত করার ইচ্ছা থেকেই ব্রতক্রিয়ার উৎপত্তি। বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষের কামনা সফল হতে চাইছে এই হল ব্রত, যা পুরাণের

চেয়ে পুরোনো বেদের সমসাময়িক কিংবা তারও পূর্বেকার মানুষের অনুষ্ঠান।''[১৪]

এছাড়াও ব্রত কথাগুলির উদ্ভবের পেছনে শিল্প চেতনারও সম্ভাবনা তিনি উল্লেখ করেছেন। এখানে শাস্ত্রীয় দেবদেবীর পূজার পরিবর্তে লৌকিক দেবদেবীর পূজা হয়। তাদের বিশ্বাস এর ফলে তাদের নানা কামনা চরিতার্থ হবে। তাই দেখা যায় ব্রতের কাহিনীর মধ্য দিয়ে গ্রামীন মেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবনের আশা-আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখ প্রকাশিত হয়। ব্রতকথা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন — ''রূপকথা মানুষের কল্পনা শক্তিকে উজ্জীবিত করে এবং ব্রতকথা তার ঐহিক আকাঙ্খাকে তৃপ্ত করে। ব্রতকথার জগৎ পার্থিব জগৎ। তবে ধর্মীয় ভাবাপন্ন হবার ফলে ব্রতকথাগুলি নাটকীয় গতিসম্পন্ন হতে পারে না। এদের নৃতাত্ত্বিক মূল্য অপরিসীম।''[১৫]

লোকসমাজে প্রচলিত ব্রতকথাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ব্রত হল — তুষ-তুষলি, মাঘমণ্ডল, বসুধারা, দশপুতুল, পুণ্যিপুকুর, যমপুকুর ব্রত প্রভৃতি।

গ) পশুকথা ঃ যে সকল লোককথাগুলির মধ্যে পশুচরিত্র থাকে তাকে পশুকথা বলা হয়। তবে এই পশুকথাগুলিতে পশুদের পাশাপাশি মানুষ ও পাখিদেরও দেখা মেলে। এখানে অবস্থানকারী জীব-জন্তুরা মানুষের মতোই কথা বলে, আচার-আচরণ করে। কাহিনীর শেষে কোনো নীতিবাক্য থাকে না এই গল্পগুলিতে। এইসব গল্পগুলির মধ্য দিয়ে দুর্বল, পরাজিত মানুষেরা পশু-পাখির রূপকে নিজেদের সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করেছে। নিজেরে ব্যথা, বেদনা, বক্তব্য সব কিছুই তাদের মধ্যে পরিবেশন করেছে।

ঘ) পরীকথা ঃ পরীকথা শব্দটি এসেছে ইংরেজী 'Fairy Tales' থেকে। যে সকল কাহিনীতে পরীদের দেখা মেলে তাদের পরীকথা বলে। তবে পরীদের সাথে সাথে এখানে মানুষেরও দেখা মেলে। রূপকথার মতোই এখানেও অলৌকিকতার ঠাঁই মেলে। তবে রূপকথার সাথে এর পার্থক্য হল রূপকথাতে পরী না থাকলে কিছু যায় আসে না, কিন্তু পরীকথাতে পরী অবশ্যই থাকবে। মানুষের বিশ্বাস এই পরীরা আকাশ লোকে বাস করে। কখনো কখনো তারা এই মাটির পৃথিবীতে নেমে আসে, মর্ত্যমানুষের সাথে ঘর বাঁধে। আবার মর্ত্যমানুষকে তারা কখনো নিজেদের রাজ্যে উড়িয়ে নিয়ে যায়, সময়ে সময়ে পৃথিবীতে আবার ফিরে আসে। ইউরোপীয় সাহিত্যের মতো আমাদের সাহিত্যে পরীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না।

ঙ) নীতিকথা ঃ এই সব গল্পে মূলত পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ মূল ভূমিকা পালন করে। মানুষও মাঝে মাঝে এই গল্পে দেখা যায়। এখানে পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গেরা মানুষের মত কথা বলতে পারে, আচার-আচরণও অনেকটা মানুষের মতো। তবে এই গল্পের শেষে নীতিকথা অবশ্যই থাকবে। যা

সমাজ শিক্ষার বাহক হিসেবে কাজ করে। এইসব গল্প অত্যন্ত সহজ সরল হয়। বাংলা নীতিকথা বা উপকথায় যেসব পশু-পাখির দেখা মেলে তাদের মধ্যে শৃগাল প্রধান ভূমিকা পালন করে। এরই পাশাপাশি বাঘ, কাক, টুনটুনি, চড়ুই প্রভৃতি পশু ও পাখিদের দেখতে পাওয়া যায়। হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, ঈশপ'স ফেব্‌ল এর গল্প এই জাতীয় গল্পের দৃষ্টান্ত।

চ) কিংবদন্তী (Leyends) ঃ কিংবদন্তী একপ্রকার কীর্তিমান মানুষের গল্প কথা। পরবর্তী সময়ে তাতে অলৌকিকতার অনুপ্রবেশ ঘটতেও দেখা যায়। এর সম্পর্কে বলতে গিয়ে মযহারুল ইসলাম বলেছেন — ''যে লোককাহিনীগুলোতে অতীতকালের কোনো বীরপুরুষ, কোনো জনপ্রিয় সম্রাট, কোনো সমাজসেবী জননেতা, কোনো বিখ্যাত কবি, দুর্দান্ত ও অত্যাচারী সম্রাট বা ক্ষমতাবান ব্যক্তি এবং এই জাতীয় চরিত্রের একটি বা একাধিক কাহিনী বর্ণিত হয়, সেগুলোই কিংবদন্তী।''[১৬]

এই কিংবদন্তী ইতিহাসের নানা তথ্যের জোগান দেয়। তবে কিংবদন্তী যখন গড়ে তখন তাতে সত্য ঘটনার ছাপ থাকে। পরে তাতে কল্পনার অনুপ্রবেশ ঘটে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কিংবদন্তী গড়ে ওঠে। যেমন — বিভিন্ন স্থান, কোনো বীর, সাধক বা প্রাণীকে নিয়ে কিংবদন্তী তৈরী হয়।

ছ) লোকপুরাণ (Myths) ঃ Myths এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে পুরাকথা, পুরাকাহিনী, পুরাণ, লোকপুরাণ প্রভৃতি প্রচলিত। এই লোকপুরাণ বা পুরাকাহিনীর সঙ্গে ধর্মীয় বোধও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এরই পাশাপাশি এই কাহিনীগুলির মধ্যে অলৌকিক ব্যাপারগুলিও খুব গুরুত্ব পেয়েছে। লোকপুরাণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মযহারুল ইসলাম বলেছেন — ''মানুষের আদিতম বিশ্বাস, চিন্তাভাবনা, আচার-আচরণ, ভয়-ভীতি, বিপদ থেকে উদ্ধারের ব্যাকুলতা, ধর্মীয় চেতনা, জৈবিক আবেদন, মানসিক উতেতেজনা ও উদ্বেল, হৃদয়বৃত্তির নানাদিক যেসব কাহিনীতে প্রতিফলিত, সেগুলোকেই বলা যায় পুরাকাহিনী। এই কাহিনীগুলোতে কেবল দেবতাদের কথা অথবা মানুষ ও দেবতাদের সম্মিলিত কাহিনী থাকতে পারে, থাকতে পারে পৃথিবী, মানুষ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা ইত্যাদির জন্ম বৃত্তান্ত, থাকতে পারে প্রতিকূল প্রকৃতির সাথে মানুষের নানাবিধ সংঘর্ষের বর্ণনা, থাকতে পারে বিরাটকায় হিংস্র জন্তু, দানবীয় প্রাণী, অসুর প্রভৃতির সঙ্গে দেবতাদের অথবা মানুষের যুদ্ধের বিবরণ, থাকতে পারে সুন্দর রমনী, রাজ্যাধিকার, বংশ গৌরব ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে অথবা দেবতায় মানুষে যুদ্ধ বিবাদের পুরাবৃত্ত। বলা যায় দেশে দেশে, সংস্কৃতিতে সংস্কৃতিতে যে প্রাচীনতম লোককাহিনীগুলো আছে সেগুলোই পুরাকাহিনী।''[১৭]

লোকসাহিত্যের অপর একটি বিশেষ ভাগ হল লোকসঙ্গীত। সঙ্গীত মানুষের শ্রমযন্ত্রনা কমিয়ে দেয়, আর সঙ্গীতের প্রতিমানুষের টান সহজাত। লোকসমাজে সৃষ্ট এবং মৌখিকভাবে প্রচারিত সঙ্গীতকেই লোকসঙ্গীত বলা হয়ে থাকে। আসলে বাংলার প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মনোরম জলহাওয়া এই লোকসঙ্গ

ীতের বিকাশ সাধনে প্রভূত সহায়তা করেছে। লোকসঙ্গীত সম্পর্কে বলতে গিয়ে বরুণকুমার চক্রবর্তী বলেছেন — ''এই লোকসঙ্গীত রচনার সময় কিংবা স্রষ্টা সম্পর্কে যে নিশ্চিতভাবে কোন তথ্য জানা যায় না, তার কারণ ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা বিশেষ কোন সঙ্গীত রচিত হলেও তিনি সেই সঙ্গীত রচনা করেন সংহত সমাজের মুখপাত্র রূপে।''[১৮]

লোকসঙ্গীতের কিছু বৈশিষ্ট চোখে পড়ে — প্রথমতঃ লোকসঙ্গীতের সুর সহজ-সরল হয়ে থাকে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জটিলতা একে স্পর্শ করে না। দ্বিতীয়তঃ লোকসঙ্গীতে আধুনিক যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহার দেখা যায় না। চোখে পড়ে লোকবাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার। তৃতীয়তঃ অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন লোকসঙ্গীতের প্রচলন দেখা যায়। চতুর্থতঃ লোকসঙ্গীতের সাহিত্য মূল্য অস্বীকার করা যায় না। তাই দেখা যায় আমাদের সমাজে লোকসঙ্গীতগুলি যুগ পরম্পরায় প্রবাহমান।

লোকসমাজে প্রচলিত লোকসঙ্গীতগুলি হল —

ক) আঞ্চলিক সঙ্গীত ঃ ভাটিয়ালি, ঘাটু, ভাদু, টুসু, পটুয়ার গান, ঝুমুর, গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া প্রভৃতি।

খ) ব্যবহারিক সঙ্গীত ঃ বিবাহের গান, শোকসঙ্গীত।

গ) আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত ঃ পার্বন সঙ্গীত, জারি গান।

ঘ) প্রেম সঙ্গীত ঃ বারমাস্যা, লৌকিক প্রেম সঙ্গীত, পৌরাণিক প্রেম সঙ্গীত।

ঙ) কর্ম সঙ্গীত ঃ ধানভানার গান, চাষের গান, নৌকা বাইচের গান।

চ) বিবিধ সঙ্গীত ঃ পাঁচালী, ধামালী, ঝাপান, পুতুল নাচের গান।

সারি গান সমবেত ভাবে গাওযা হয়। এই গানের মূল বিষয়বস্তু হল প্রেম। ভাটিয়ালি গান সমবেত ভাবে গাওয়া হয় না। এটি একক সঙ্গীত। এর জন্ম নদ-নদীতে ভরা পূর্ব বাংলা। ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী এই গান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন — ''নদীর ভাটি দিয়ে নৌকা বেয়ে যেতে যেতে নৌকার মাঝিগন যে গান গাইত তাকেই ভাটিয়ালি বলা হতো।''[১৯] ভাটির টানে ভেসে চলা নৌকায় অবস্থানকারী মাঝির কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত এই গান তার জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খাকেই ব্যক্ত করে তোলে। ভাওয়াইয়া প্রধানতঃ উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলায় প্রচলিত। এই গানে ছেড়ে চলে যাওয়া প্রেমিকের জন্য সরল গ্রাম্য প্রেমিকারা বিলাপ করে থাকে। মালদহ জেলায় প্রধানত শিবকে নিয়ে রচিত গানই গম্ভীরা গান নামে পরিচিত। তবে এই গানের মধ্য দিয়ে একটি অঞ্চলের সারা বছরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চালচিত্রের কথা তুলে ধরা হয়। ঝুমুর একপ্রকার প্রেম মূলক সঙ্গীত। বাঁকুড়া, বীরভুম, পুরুলিয়া অঞ্চলে এই গানের প্রচলন দেখা যায়। এই গানে কৃষ্ণ ও

রাধার কথা বারবার আসে। ভাদুগান প্রধানত পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলাতে দেখা যায়। এই গানে কুমারী মেয়েরা অংশ গ্রহণ করে। ভাদ্র মাসের পূর্ণ বর্ষায় কুমারী মেয়েদের দ্বারা গাওয়া এই গানে তাদের হৃদয়ের কথাই যেন ব্যক্ত হয়। টুসু হল কৃষির দেবী। পৌষ মাসে টুসুদেবীর পূজার সময় যে গান গাওয়া হয় তাই টুসুগান। সারা পৌষ মাস ধরে রাত জেগে চলে এই গান। তবে এই গানে দেবীর বন্দনা থাকলেও তাকে ছাড়িয়ে সাংসারিক জীবনের সুখ-দুঃখের কথাই যেন বেশি করে মূর্ত হয়ে ওঠে।

লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ ভাগ হল প্রবাদ, ইংরাজী 'Proverb' থেকে প্রবাদ শব্দটি এসেছে। প্রবাদ সম্পর্কে স্পেন দেশীয় একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার ইংরেজী অনুবাদ করলে দাঁড়ায় — 'A proverb is a short sentence : bassed on long expericnce.'অর্থাৎ প্রবাদ হল দীর্ঘ অভিজ্ঞাতার সংক্ষিপ্ততম রূপ। তবে প্রবাদ যে সবসময় সংক্ষিপ্তই হবে তার কোনো মানে নেই। প্রবাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে দুলাল চৌধুরী বলেছেন — ''প্রবাদ গোষ্ঠী জীবনের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত সরস অভিব্যক্তি। এখানে সরস কথাটির মধ্যে অনেক বিষয়ই বিবৃত রহিয়াছে, যেমন ইহার গঠন কৌশল। গঠন কৌশল বলিতে ইহার ব্যঙ্গ, শ্লেষ এবং রূপক অলঙ্কারের ব্যবহার, ইহার পদ্য ছন্দ ইত্যাদি সকলই বুঝাইবে।''[২০] মানুষ তার চলার পথে বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতা থেকেই প্রবাদের সৃষ্টি করেছে। সহজ, সরল ভাষায় প্রবাদের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

লোকসমাজে পারিবারিক জীবন, পুরাণ, ইতিহাস ও কৃষি, সমাজ জীবন প্রভৃতি নিয়ে বহুল প্রবাদ প্রচলিত আছে। যেমন — কৃষিকাজ সংক্রান্ত একটি প্রবাদ — 'আশায় মরে চাষা।' কৃষিকাজই চাষীর মূল উপার্জনের ক্ষেত্র। সব বছরই আশানুরূপ ফসল ফলে না। তবু তারা তাদের আশা ছাড়ে না। আগামী বছর ভালো ফসল ফলবে এই আশায় বুক বেঁধে থাকে।

লোকসাহিত্যের অপর একটি বহু চর্চিত বিষয় হল ছড়া। এটি সংস্কৃত 'ছটা' শব্দ থেকে এসেছে বলে অনেকে মনে করেন। ছড়া হল মিলযুক্ত ছোটো কবিতা। একে মনে রাখতে হয় বলে ছড়ার আকার বৃহৎ হয় না। ছড়ার ব্যবহার সমাজে বিভিন্ন সময় হতে দেখা যায়। যেমন — উৎসব অনুষ্ঠানে, পারিবারিক সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নায়, অবসর বিনোদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে। এরই পাশাপাশি কবিগান, যাত্রা, তরজায় ছড়ার ব্যহহার লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত ছড়ার উৎসভূমি বলতে গিয়ে জানিয়েছেন — ''কালগতভাবে বিচার করলে, ছড়াকে সম্ভবত মানুষের আদিমতম সাহিত্য প্রয়াসগুলির একটি বলেই ধার্য করতে হয়। সভ্যতার প্রদোষলগ্নে আমাদের প্রাচীন পিতামহরা যখন বহু বিচিত্র দেবতাদের অস্তিত্ব কল্পনা করে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে স্তব-স্তুতি ইত্যাদি নিবেদন করতেন ছন্দ ও সুরের মাধ্যমে, তখন থেকেই ছড়ার উৎসারণের পথও খুলে যায়। অর্থাৎ আদিম মন্ত্রই কালের বিবর্তনে

ছড়ায় পরিণতি লাভ করেছে। কালক্রমে তার অন্তর্লীন ধর্মবিশ্বাসের ভাবানুষঙ্গটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিলুপ্ত; সেই জায়গায় পারিবারিক বা সামাজিক কিছু-কিছু অনুভূতি বক্তব্যের মাধ্যমে গাঢ়বদ্ধভাবে সঞ্চিত হয়েছে ছড়ার ভিতর।''[২১]

ছড়া প্রধানত স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত হতে দেখা যায়। আর এর ভাষা সহজ-সরল হয়। আর ছড়ার অপর একদিক এর চিত্রধর্মিতা। ছড়ার বিভিন্ন ভাগ রয়েছে। ছড়াকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা — ক) সাহিত্যিক ছড়া, খ) লৌকিক ছড়া। আবার এই লৌকিক ছড়ার নানা ভাগ রয়েছে। আনুষ্ঠানিক ছড়া, শিক্ষামূলক ছড়া, ছেলে ভোলানো ছড়া, ছেলে খেলানো ছড়া, মেয়েলি ছড়া, ব্রতের ছড়া প্রভৃতি। শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য অনেক সময় ছড়া রচিত হয়। দেখা যায় তারা ছড়ার কোনো অর্থ না বুঝেই সেখান থেকে আনন্দ লাভ করে। ছড়া তাদের চোখে স্বপ্নের মায়াজাল বিস্তার করে। ছড়ার ছন্দ তাদের কানে এক আকর্ষণের সৃষ্টি করে। তাই দেখা যায় শিশুকে ঘুম পাড়াতে বা শিশুকে ভোলানোর জন্য মাতা ছড়ার আশ্রয় নেন। তেমন একটি ছড়া —

''পুঁটু যাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে যাবে কে?
ঘরে আছে কুনো বেড়াল কোমর বেঁধেছে।''

আবার অপর একটি ছড়ায় লক্ষ্য করা যায় ইতিহাসের ঘটনার কথা —

''ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়াল বর্গি এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।''

একসম যে বাংলায় বর্গির আক্রমণ ঘটেছিল তার কথা এই ছড়ার মাধ্যমেও উল্লেখ হতে দেখা যায়। এভাবেই একটি ছড়া সমজের নানাবিধ কার্য সাধন করে থাকে।

ছড়ার পরেই লোকসাহিত্যের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ধাঁধার নাম উল্লেখ করা যায়। এর উৎপত্তি সংস্কৃত 'দ্বন্দ্ব' শব্দ থেকে। যেমন - দ্বন্দ্ব > ধন্দ > ধন্ধ > ধাঁধা। আবার ইংরেজীতে একে 'Riddle' বলা হয়ে থাকে। আবার কখনো এটি হেঁয়ালি হিসেবেও উল্লেখিত হয়। ধাঁধার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ডঃ শীলা বসাক বলেছেন — ''যে বাক্য দ্বারা একটি মাত্র ভাব রূপকের সাহায্যে জিজ্ঞাসার আকারে প্রকাশিত করা হয় তাকে ধাঁধা বলে। ... ধাঁধা শুধু ধন্দ লাগায় না, দ্বন্দ্বেরও সৃষ্টি করে। বস্তুত ধাঁধা একটি জটিল জিজ্ঞাসা, দুরূহ প্রশ্ন, আবার সমস্যাও। ধাঁধার স্বরূপ ধাঁধার ভাষাতেই নিহত। ... প্রথম দৃষ্টিতে ধাঁধা রহস্যময় বলে মনে হয়, কিন্তু তাৎপর্য বিশ্লেষণে সামান্য মনোযোগী হলে মীমাংসাটি ধরা পড়ে।''[২২]

ধাঁধা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে পল্লব সেনগুপ্ত বলেছেন — ''ধাঁধা আসলে এক ধরনের ঐতিহ্যবাহী

জ্ঞানের ভাণ্ডার; এদিক থেকে দেখলে একে প্রবাদেরই জ্ঞাতি বলে গণ্য করতে পারি। এ-দুয়ের মাধ্যমেই একটি জাতি বা কৌমের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের বহুবিচিত্র সব অভিব্যক্তি উদ্ভাসিত হয়ে থাকে।''[২৩]

তিনি আবার অন্যত্র বলেছেন — ''প্রবাদ এবং ধাঁধা কিছুটা সহধর্মী ঠিকই; অন্তত বাগবৈদগ্ধ, জীবন অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহ্যমুখিনতার ক্ষেত্রে। কিন্তু মূল তফাৎটা হল এই যে, ধাঁধাতে অভিপ্রেত বক্তব্যটি প্রচ্ছন্ন রাখার জন্য একটা সামগ্রিক প্রয়াস দেখা যায়, পক্ষান্তরে প্রবাদে বক্তব্য বিষয়টি বোঝানো হয় যতটা সম্ভব স্পষ্ট করেই।''[২৪]

ধাঁধার ব্যবহার সাহিত্যের সমস্ত ক্ষেত্রেই দেখা যায়। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত থেকে শুরু করে চর্যাপদ, ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি রচনায় ধাঁধার দেখা মেলে। লোকসাহিত্যে নানা প্রকার লৌকিক ধাঁধার পরিচয় মেলে।

কৃষি বিষয়ক ঃ ''এতটুকু গাছে, কেষ্ঠ ঠাকুর নাচে।'' — বেগুন গাছ।

দেবদেবী বিষয়ক ঃ ''শ্বশুরের পুত্র নয় স্বামী বল কার, দশ হস্ত পঞ্চমুণ্ড স্বামী যে তাহার।'' — দ্রৌপদী।

পশু-পাখি বিষয়ক ঃ ''ছাই ভিন্ন শোয় না, লাথি ভিন্ন ওঠে না।'' — কুকুর।

গার্হস্থ্য জীবন কেন্দ্রিক ঃ ''ইতি উতি যায়, মুখ তুলে চায়।'' — সূঁচ।

ধাঁধার অবশ্যই দুই পক্ষের উপস্থিতির প্রয়োজন হয়। একদিকে থাকে প্রশ্নকর্তা, আর অপর দিকে উত্তরদাতা। ধাঁধাকে আপাত কঠিন মনে হলেও এর উত্তর প্রশ্নটির মধ্যে রূপকের মোড়কে বাঁধা থাকে।

ধর্ম বলতে বোঝায় যা মানুষকে ধারণ করে রাখে। মানুষ যেখানে আশ্রয় পায়। 'লোকধর্ম' কথাটি ইংরেজী 'Folk Religion' শব্দ থেকে এসেছে। বাংলাদেশের জল হাওয়ায় বেড়ে ওঠা মানুষ প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে, বিভিন্ন ব্যাধি ও সংকট থেকে উদ্ধার পেতে নানান লৌকিক দেব-দেবীর চরণে আশ্রয় নিয়েছে। আর এই ভাবেই সমাজে লৌকিক দেব-দেবীর আরাধনা শুরু হয়েছে। লোকসমাজে নানা লোক ধর্মের মানুষের দেখা মেলে। সাহেবধনী, বলরামী, কর্তাভাজা, বাউল, সহজিয়া প্রভৃতি নামে। লোকধর্মে সব ধর্ম সমন্বয়ের সুর শোনা যায়।

খেলাধূলা মানুষের নানান দৈহিক বিকাশ ঘটায়। এই ক্রীড়া বা খেলাধূলার মধ্য দিয়ে মানুষ আবার অবসর বিনোদনও করে। লোক সমাজেও একাধিক লোকক্রীড়ার প্রচলন রয়েছে। এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ডঃ বরুন কুমার চক্রবর্তী বলেছেন — ''আঞ্চলিকতার পরিচয় বিশিষ্ট সহজলভ্য উপকরণ

নির্ভর অথবা উপকরণ বিহীন, ছড়া সম্পৃক্ত অথবা ছড়া বিহীন ঐতিহ্যানুসারী যে ক্রীড়া নমনীয় নিয়মানুসারী গৃহাভ্যন্তরে আথবা প্রকৃতির উষ্ণ সান্নিধ্যে অনুষ্ঠিত হয়, সাধারণত যে ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণকারীদের নিবিড় অনুশীলন অথবা শিক্ষানবিশীর প্রয়োজন হয় না, মেয়ে কিংবা উভয় লিঙ্গের খেলোয়াড়ের দৈহিক পুষ্টি অথবা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন হয়, যা আপাতভাবে গুরুত্বহীন অথচ সূক্ষ্ম পর্যালোচনায় যে খেলার জীবনের অনুকৃতি কিংবা ফেলে আসা অতীত জীবন চর্চার পুনরিভিনয় লক্ষিত হয়, যাতে আমাদর আর্থ সামাজিক ইতিহাসের প্রত্নাবশেষের সন্ধান লভ্য তাই হল লোকক্রীড়া।''[২৫]

এই লোকক্রীড়াগুলিকে বিশ্লেষণ করলে প্রচীন মানুষের জীবন যাত্রার অনেক ছবিই উঠে আসে। সমাজের ক্রমবিকাশের ধারায় বিভিন্ন লোকক্রীড়ার সৃষ্টি হয়েছে। তাই একে কোন ব্যক্তি বা কালের সীমারেখায় বেঁধে ফেলা যায় না। বাংলার বিভিন্ন লোকক্রীড়াগুলি হল — ডাং-গুলি, হা-ডু-ডু, গাদি, গোল্লাছুট, বাঘবন্দী, কানামাছি, লুকোচুরি, এককা-দোককা, পুতুল খেলা, গুটি খেলা প্রভৃতি। বিবিধ খেলাগুলি ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য বহন করে। 'কুমীর-ডাঙা' খেলায় নদী তীরে বাস করা মানুষের জীবন সংগ্রামের ছবি পরিস্ফুট হয়। আবার 'লুকোচুরি' খেলার মাধ্যমে আদিম মানুষের শিকার করার ছবিটি ফুটে ওঠে। এভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় লোক ক্রীড়াগুলির মধ্যে লোক সংস্কৃতির বিবিধ পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে। তাই এগুলি আমাদের লোক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

লোকসমাজে বসবাসকারী মানুষজন তাঁদের সহজাত বিদ্যে বুদ্ধি দিয়ে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। তারা বিভিন্ন রোগ-যন্ত্রণার উপশমে গাছ-গাছড়ার প্রয়োগ করেছে, কাপড়ের গিঁটে দিয়ে তারা হিসাব মনে রেখেছে, দুধ থেকে নানা খাবার তৈরী করেছে। কখনো ভাতকে পচিয়ে তা থেকে পানীয় তৈরী করেছে। তাল গাছের, খেজুর গাছের রস থেকে নেশা দ্রব্য প্রস্তুত করে নিয়েছে। এ সমস্ত কিছুই লোকবিজ্ঞানের অন্তর্গত। বংশ পরম্পরায় তাদের এই জ্ঞান সঞ্চারিত হয়।

লোকসমাজে বসবাসকারী মানুষজন তাঁদের জীবনযাত্রায় নানা আচার-আচরণ পালন করে থাকে। সেগুলিই হল লোকাচার। এই লোকাচার মানব জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। এটি একটি প্রথা, যখন এই প্রথা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয় তখনই তা লোকচারে পরিণত হয়। এগুলি পালন করলে শুভ ফল পাওয়া যায় এমন বিশ্বাস তাঁদের মধ্যে কাজ করে। আমাদের সমাজে যে সমস্ত লোকাচার দেখা যায় তার মধ্যে শিশুর জন্ম বিষয়ক নানান লোকাচার — ষেটেরা, আটকলাই, নত্তা ইত্যাদি। বিবাহ সংক্রান্ত — গায়ে হলুদ, সাতপাক, বাসি বিয়ে ইত্যাদি। মৃত্যু সংক্রান্ত লোকচার — অন্ত্যেষ্টি। কৃষিকাজ সংক্রান্ত — অক্ষয় তৃতীয়া, অরন্ধন, অম্বুবাচী, অলক্ষ্মী বিদায় ইত্যাদি।

লোকসমাজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। তাদের ভিন্ন রুচি, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, সংস্কার তাদেরকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে স্বকীয় থাকতে সাহায্য করে। লোকসমাজে বসবাসকারী বিভিন্ন লোকসম্প্রদায় হল — কামার, কুমোর, জেলে, তাঁতি, কাহার, বেনে প্রভৃতি।

লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচনায় কীভাবে ব্যবহার করেছেন তা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

—০—

তথ্যসূত্র

১) ইসলাম মযহারুল ঃ ফোকলোর পরিচিত ও পঠন-পাঠন, অবসর, আগষ্ট, ১৯৬৭, পৃঃ ৮।

২) চক্রবর্তী বরুণ কুমার ঃ লোকবিশ্বাস ও লোক-সংস্করার, ভাদ্র, ১৩৮৭, পৃঃ ২০।

৩) চৌধুরী দুলাল ঃ বাংলার লোকউৎসব, ১৯৮৭ খ্রীঃ, পৃঃ ২৬।

৪) ভট্টাচার্য আশুতোষ ঃ বাংলার লোকসংস্কৃতি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইণ্ডিয়া, ২০১৪, পৃঃ ৬৬।

৫) ভট্টাচার্য আশুতোষ ঃ প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১২৯।

৬) মুখোপাধ্যায় দুর্গাশঙ্কর ঃ নাট্যতত্ত্ব-বিচার, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯১, পৃঃ ২৬৫।

৭) ভৌমিক নির্মলেন্দু ঃ জনজীবন, সংহত গোষ্ঠী ও বাঙলার লোকনাট্য, লোকশ্রুতি, সংকলন সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৬, পৃঃ ৫০।

৮) Encyclopaedia : Britanica, 1970, Ed. Volume - 9, P. - 516.

৯) ভট্টাচার্য আশুতোষ ঃ বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, ১৯৬২, পৃঃ ১।

১০) ইসলাম মযহারুল ঃ প্রগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ - ২৪।

১১) পাল অনিমেষকান্তি ঃ লোকসংস্কৃতি, প্রজ্ঞাবিকাশ, জানুয়ারী, ১৯৯৬, পৃঃ ১১৬।

১২) ভট্টাচার্য আশুতোষ ঃ বাংলার লোকসংস্কৃতি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইণ্ডিয়া, ২০১৪, পৃঃ ১০০।

১৩) ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ ঃ বাংলার ব্রত, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ফাল্গুন ১৪০৭, পৃঃ ৫।

১৪) ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ ঃ প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১১।

১৫) ভট্টাচার্য আশুতোষ ঃ বাংলার লোকসংস্কৃতি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইণ্ডিয়া, ২০১৪, পৃঃ ১০১।

১৬) ইসলাম মযহারুল ঃ ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, অবসর, আগষ্ট, ১৯৬৭, পৃঃ ৩৬।

১৭) ইসলাম মযহারুল ঃ প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৮।

১৮) চক্রবর্তী বরুণ কুমার ঃ বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, নভেম্বর, ১৯৭৭, পৃঃ ২৯৩।

১৯) সিদ্দিকী আশরাফ ঃ লোকসাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড), নয়া উদ্যোগ, ২০১৩, পৃঃ ৮৭।

২০) চৌধুরী দুলাল ঃ বাংলা লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অব ফোকলোর, ২০০৪ খ্রীঃ, পৃঃ ৯৭।

২১) সেনগুপ্ত পল্লব ঃ লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর, ১৯৯৫, পৃঃ ১৯৮-১৯৯।

২২) বসাক শীলা ঃ বাংলা ধাঁধার বিষয় বৈচিত্র্য ও সমাজিক পরিচয়, পুস্তক বিপণি, জুলাই, ১৯৯০, পৃঃ ১-২।

২৩) সেনগুপ্ত পল্লব ঃ লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর, ১৯৯৫, পৃঃ ১৮৩।

২৪) সেনগুপ্ত পল্লব ঃ প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৯৬-১৯৭।

২৫) চক্রবর্তী বরুণ কুমার ঃ 'বাংলার লোকক্রীড়া', লোক সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলিকাতা, ২০০১, পৃঃ ৪-৫।

—০—